গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কী আশ্চর্য! ভোটের বছরেই জি ডি পি লাফ দিয়ে বেড়ে যায়

বিজেপির শাসনে সুখের শিহরণ (ফিল গুড) জাগছে জনগণের মনে, অন্তত কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে তেমনই ভাবাতে চাইছে বিজেপি সরকার। তারা বলছে, গত বছর মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৮.১ শতাংশ। গত পঞ্চাশ বছরে নাকি এমন আর্থিক উন্নয়ন ঘটেনি !

অথচ তথ্য বলছে — প্রতিটি ভোটের বছরেই ম্যাজিকের মতো 'উন্নয়নের' পরিসংখ্যান লাফ দিয়ে বেড়ে যায়। গত আটটি নির্বাচনের মধ্যে পাঁচবারই দেখা গেছে, জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭ শতাংশের বেশি। '৮৯ সালে নির্বাচনের সময় তো এই হার ১০.৫ শতাংশ দেখানো হয়েছিল, যা ভারতের সর্বকালীন রেকর্ড। ঐ নির্বাচন কংগ্রেস সরকারের আমলে হয়েছিল। অর্থাৎ জিডিপি বৃদ্ধির ম্যাজিকের যাদুকর সেদিন ছিল কংগ্রেস। একমাত্র ১৯৬৭ সাল বাদে প্রত্যেকটি নির্বাচনের বছরেই বিকাশের হার আগের বছরের তুলনায় হঠাৎ করে বেড়েছে। ১৯৭৭ সালে বিকাশের হার ছিল ৯ শতাংশ, '৮৪ সালে ৭.৭ শতাংশ, '৮৯ সালে ১০.৫ শতাংশ, '৯৬ সালে ৭.৩ শতাংশ। কী আছে এই ম্যাজিকের পিছনে? জনগণের আর্থিক সঙ্কটের সুরাহা নেই, মজুরি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নেই। তাই জীবন দিয়ে ৯০ শতাংশ মানুষ তা বোঝেন না, সরকারকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝাতে হয়।

মিথ্যার একেবারে হদ্দমুদ্দ। ভোট এলেই সে বছর বিকাশের হার লাফ দিয়ে বাড়ে। কারণ গল্পের গরুই গাছে ওঠে, সত্যিকার গরু যা পারে না।

(সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস ১৭.২.০৪)

সরকারি টাকা নয়ছয়ে কেউ পিছিয়ে নেই

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরদিনই টি এস কৃষ্ণমূর্তি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, কোন দলেরই উচিত নয় নির্বাচনের আগে সরকারি তহবিল খরচ করে সরকারি 'সাফল্যে'র বিজ্ঞাপন দেওয়া। মনে রাখা দরকার, সরকারি কোষাগারে জমা টাকা দেশের জনগণের। সেই টাকা এভাবে দলীয় প্রচারের জন্য ব্যয় করা অনৈতিক। কৃষ্ণমূর্তি একথাও বলেছিলেন যে, 'নির্বাচন ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী বিধি কার্যকর হয় না একথা ঠিক, সে অর্থে কাজটাকে আমি বেআইনি বলছি না, এখানে প্রশ্নটা নৈতিকতার।'

পরের দিনই বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হল, নির্বাচন কমিশনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে কাজটা বেআইনি নয়, ফলে বিজেপি সরকারের প্রচার চলবে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী, যিনি নৈতিকতা, সদাচার, সুশাসন, রাজধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে কবিতায় ও বক্তৃতায় জ্ঞান বিতরণ করে থাকেন, তিনি সাফ বলে দিলেন, ''বিজ্ঞাপন যেমন দেওয়া চলছে, তেমনই চলবে। নির্বাচন

চারের পাতায় দেখুন

পরের ধনে পোদ্দারি

'ভারত উদয়' বিজ্ঞাপনে বিজেপির দাবি তাদের সুশাসনে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার উপচে পড়ছে, শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়েছে।

কী আছে নেপথ্যে? আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির পরামর্শদাতা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর সংস্থা ভারতের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের উচ্চ মুনাফা সম্পর্কে মুক্তকচ্ছ হয়ে প্রশংসা করেছে। শুধু গত বছরই ভারতের শেয়ার বাজারে ফাটকা খাটাতে বিদেশি পুঁজি এসেছে ৭০০ কোটি ডলার। এ বছর তা ২০০০ কোটি ডলার হবে বলে তারা আশা করছে। বলা বাহুল্য, এটা নতুন বিনিয়োগ নয়, কেবল চালু শেয়ার হাতবদল। ফলে এর দ্বারা শিল্পের প্রসার আদৌ ঘটবে না। বিদেশি বিনিয়োগ ডলারে হওয়ায় তা ব্যাঙ্ক মারফত ডলার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে ডলার আমানতে সুদের হার বেশি থাকায় অনাবাসী ভারতীয়দের আমানত হিসাবেও বিশাল অঙ্কের ডলার এসেছে। এই ভাণ্ডার আজ আছে কাল নেই। এ সম্পর্কে বর্তমান (২০-২-০৪) পত্রিকায় অভিরূপ সরকার লিখেছেন — ''সামান্যতম গণ্ডগোল দেখলেই বিদেশিরা কিংবা অনাবাসী ভারতীয়রা এই টাকা এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ আমাদের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারের ভিতটা নেহাতই নড়বড়ে।'' সরকারি প্রচারে শেয়ার বাজার যে চাঙ্গা, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার যে উপচে পড়ছে তার পেছনে বড় ভূমিকা পালন করছে এই বিদেশি লগ্নী পুঁজি। আর ভোটের মুখে পরের ধনে পোদ্দারি করছে বিজেপি নেতারা।

গণআন্দোলনের ঐতিহ্যকে অসম্মান করলেন মুখ্যমন্ত্রী

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

''গদী রক্ষার প্রয়োজনে রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশি ও দেশি শিল্পপতিদের তুষ্ট করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এতদূর নেমেছেন যে তিনি ১৯৬৭-৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় গড়ে ওঠা সংগ্রামী ঐতিহ্যকে 'সিরিয়াস নুইসেন্স' বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বড় দল হিসাবে অতীতের এই বামপন্থী আন্দোলনের গৌরবকে আত্মসাৎ করেই আজ তারা গদীতে আসীন। মুখ্যমন্ত্রী এই কুৎসিত মন্তব্যের দ্বারা এরাজ্যের গণআন্দোলনের ঐতিহ্যকেই চূড়ান্ত অসম্মান করলেন। এর প্রতিবাদ জানাবার জন্য সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি ও ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সৎ কর্মী ও সমর্থকদের এবং রাজ্যের জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি।''

বন্ধ চা-বাগান অধিগ্রহণ কর

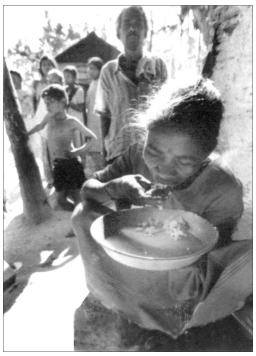

চা-শ্রমিকদের করুণ মৃত্যুর কথা জনমনকে যতই উদ্বেল করুক না কেন, চা-বাগান মালিক ও সরকারের হৃদয়ে তা কোন দাগ কাটে না। সরকার বলে, অনাহারে মৃত্যু হয়নি, হবে না! আর মৃত্যুর মিছিল দেখতে দেখতেই মালিক ভাবে কীভাবে এই অবস্থার সুযোগে আরো বেশি সুবিধা আদায় করা যায়। বন্ধ বাগান খুলতে তারা শর্ত দেয়, সরকারি সাহায্য চায়, শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধা দেওয়ার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চায়। মুনাফা লোভাতুর চা-বাগান মালিক আর 'বন্ধু' সরকারকে বিব্রত করতে চায় না প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ইউনিয়নগুলো। তাই অভয় পেয়ে, শ্রমিকদের ঠকিয়ে কেবল প্রতিশ্রুতি, কমিশন, কমিটি গঠন করে করেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে সরকার। অথচ, সদিচ্ছা যদি সত্যিই থাকত — কী তারা করতে পারত, দেখা যাক।

টি বোর্ড

চা-বাগান সুষ্ঠুভাবে চালানো এবং শ্রমিকদের স্বার্থ দেখবার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৩ সালে টি-বোর্ড (চা-পর্ষদ) গঠন করে। টি -বোর্ডের বহু আইনি ক্ষমতা আছে। সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত। বৃহৎ শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিও এতে আছেন। এর বহু ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে, (১) শ্রম আইন ভঙ্গকারী মালিককে শাস্তি দেওয়া, (২) শ্রমিকস্বার্থে নতুন আইন তৈরি করা, (৩) চা-বাগানের প্রকৃত আয়-ব্যয় পরীক্ষা করা ইত্যাদি।

কিন্তু বাস্তবে এই বোর্ড, শ্রমিক নয়, মালিকদের কথাই কেবল ভাবে। কেউ কেউ বলেন এটাকে 'অলস' করে রাখা হয়েছে। কথাটি অর্ধসত্য। শ্রমিক কল্যাণের প্রশ্নে বোর্ড 'অলস', কিন্তু মালিকরা ডেপুটেশন দিলেই নড়ে চড়ে বসে এবং তাদের আরো কী কী ট্যাক্স ছাড় দেওয়া যায়, আরও কোন্ কোন্ সুবিধা দেওয়া যায় তা ভাবতে বসে। এ ব্যাপারে বোর্ডের কোনো আলস্য নেই! কি কংগ্রেস

ছয়ের পাতায় দেখুন

বন্ধ চা বাগানের লিজ বাতিল করে সরকারি মালিকানায় চালু করা, চা-শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন ও রেশন সুনিশ্চিত করা এবং পি-এফের টাকা আত্মসাৎকারী মালিকদের কঠোর শাস্তির দাবিতে

***২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ* শামুকতলা ও শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত**

সাইকেল র‍্যালি

১ মার্চ বিভাগীয় কমিশনারের কাছে

বিক্ষোভ প্রদর্শন

এস ইউ সি আই - টি পি ই ইউ

ডি ওয়াই ও'র কলকাতা জেলা সম্মেলন

১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হল ডি ওয়াই ও'র তৃতীয় কলকাতা জেলা সম্মেলন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন শতাধিক যুবকযুবতী এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। সকল বেকারের কাজের দাবিতে, মদের ঢালাও লাইসেন্স এবং স্বনিযুক্তি প্রকল্পের নামে ভাঁওতার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সম্মেলন ছিল সোচ্চার। বহু যুবক যুবতী, যাঁরা এই সম্মেলনে প্রথম এসেছেন — যুব জীবনের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা ইনচার্জ কমরেড নীরেন কর্মকার।

সম্মেলনের শুরুতে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন ডি ওয়াই ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরী। সম্মেলনের প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল বিশ্লেষণ করে দেখান, বর্তমানের সাংস্কৃতিক সঙ্কট কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে এই সাংস্কৃতিক সঙ্কট এবং রাজনীতিতে তীব্র দেউলিয়াপনা সৃষ্টি হয়েছে। এর বিরুদ্ধে যথার্থই লড়তে হলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে শাণিত করতে হবে। সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন কমরেড রূপম চৌধুরী এবং সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস। সম্মেলন থেকে কমরেড সুরথ সরকারকে সভাপতি এবং কমরেড নিরঞ্জন নস্করকে সম্পাদক করে ৩০ জনের জেলা কমিটি ও ৩৮ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়। সম্মেলন শেষে চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বেকারি বিরোধী নাটক 'নাটকীয়' অভিনীত হয়।

উপরে ঃ বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল।
নিচে ঃ সম্মেলনের প্রতিনিধিদের একাংশ

ঘাটশিলায়

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী

ঘাটশিলায় 'কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মৃতি ফ্রি কোচিং স্কুলে'র উদ্যোগে ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন ও ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে এলাকার মানুষদের ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ সচেতনতা শিক্ষাসহ ওষুধ বণ্টন করা হয়। এদিন দুপুরে একটি পাঠাগার উদ্বোধন করেন এলাকার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডাঃ বঙ্কিম মাহাতো।

বিকাল ৩টায় জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন ও বিজ্ঞান সাধনা বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সম্পাদক ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাটশিলা কলেজের অধ্যাপক মদন মোহন প্রসাদ। প্রধান অতিথি ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শান্তি ঠাকুর। সভায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অবৈতনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনিল বিহারী পড়িয়া।

কোচবিহার

বাড়তি ভাড়া প্রতিরোধ আন্দোলনে সি পি এমের হামলা

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানায় গণআন্দোলনের কর্মীরা আবারও আক্রান্ত হল সি পি আই (এম) ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হাতে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি চিলাখানায় ৩১নং জাতীয় সড়কের উপর অযৌক্তিক বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং চিলাখানা-দেওচড়াই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে স্থানীয় এস ইউ সি আই নেতা কমরেড আছরউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে পথ অবরোধ হয়। সকাল সাড়ে নটা থেকে অবরোধ শুরু হয়। অবরোধ কিছুক্ষণের মধ্যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে জনসমুদ্রের রূপ নেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সি পি আই (এম)। সি পি আই (এম) এর লোকাল সম্পাদক কৃষ্ণধন দাসের নেতৃত্বে একদল উন্মত্ত ডাণ্ডাধারী বাহিনী অবরোধকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে কমরেড অশ্বিনী বর্মনের নাক ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। কমরেড রবিয়া সরকারের মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। ডাণ্ডার আঘাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন কমরেড অনিমা বর্মন। উপস্থিত জনসাধারণ প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়ে কমরেড আছরউদ্দিন আহমেদকে এই আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

সিপিএমের হামলায় আহত কমরেড অশ্বিনী বর্মন তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে তুফানগঞ্জ শহরে ঐদিন মিছিল করা হয়। পরের দিন ২০ ফেব্রুয়ারি চিলাখানাতেও প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করা হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড আছরউদ্দিন আহমেদ, দেবেন বর্মন প্রমুখ।

এস ইউ সি আই তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সান্ত্বনা দত্ত বলেন, আন্দোলনে ব্যাপক মানুষের সমর্থন দেখে আতঙ্কিত সি পি এম এই আক্রমণ চালিয়েছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ওরা যে মালিকদেরই পক্ষে তা আবারও প্রমাণ করল। কমরেড দত্ত যাত্রী কমিটি গড়ে তুলে বাড়তি ভাড়া বয়কটের আবেদন জানিয়েছেন।

হরিরহাটে অবরোধ ঃ বর্ধিত বাসভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ ফেব্রুয়ারি হরিরহাটেও পথ অবরোধ হয়।

রাইটার্সে অনশনকারী কর্মচারীদের উপর পুলিশের হামলা

ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর আহ্বানে ১৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাজ্যের জেলাগুলির সদরে সরকারি কর্মচারীরা অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং, বি জি প্রেস, আলিপুর প্রভৃতি স্থানেও কর্মচারীরা অনশন ধর্মঘট করেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মচারীরা অনশন ধর্মঘটে বসতে গেলে বিরাট পুলিশ বাহিনী জবরদস্তি বাধা দেয়। জোর করে অনশন অবস্থান ভেঙে দেয়। প্রতিবাদে কর্মচারীরা রাইটার্স বিল্ডিং-এ ধিক্কার মিছিল করেন। অন্যান্য কর্মচারী সংগঠনের সদস্যরাও এই পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদ জানান।

অনশন ধর্মঘটকারী কর্মচারীদের দাবি — রি-ডিপ্লয়মেন্ট-এর নামে কর্মসংকোচন ও কর্মী উদ্বৃত্ত ঘোষণার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, চুক্তির ভিত্তিতে ও বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগ করা চলবে না, সমস্ত শূন্যপদে কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে, কর্মরত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাউকে নিয়োগপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ তুলে দিতে হবে, ১৪ শতাংশ বকেয়া ডি-এ এবং ৫০ শতাংশ মূল বেতন ভিত্তিক ডি-এ দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য ১০ ফেব্রুয়ারি আগাম জানানো সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতা কর্মচারীদের ক্ষুব্ধ করেছে। এই সব ঘটনায় ক্ষুব্ধ নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী দিনে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি তাঁরা শীঘ্রই ঘোষণা করবেন।

রাজ্যব্যাপী অনশন পালনের সময় মহাকরণের কর্মচারীদের উপর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৯ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

"সি পি এম ফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী নীতি সুচারুভাবে প্রয়োগের দ্বারা একদিকে সাধারণ কর্মচারীদের আর্থিক ও অর্জিত অধিকার একের পর এক কেড়ে নিচ্ছে অন্যদিকে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করছে।" সাধারণ কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "যথার্থ সংগ্রামী নেতৃত্বে কর্মচারীদের লাগাতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আঘাতে রাজ্য সরকারের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে।"

বড়োল্যান্ড প্রসঙ্গে

গত ৭ ডিসেম্বর, ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অধীনে আসাম রাজ্যের অভ্যন্তরে বড়ো টেরিটোরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বি টি এ ডি) নামে নতুন একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত হয়েছে। এর একদিন আগে, ৬ ডিসেম্বর, পৃথক রাজ্যের দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রামে নিযুক্ত বড়ো লিবারেশন টাইগার (বি এল টি) অস্ত্র সংবরণ করে। তাদেরই সর্বাধিনায়ক হাগ্রামা বসুমাতারির নেতৃত্বে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ করেছে।

আসামে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এই নতুন নয়। অতীতে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অধীনে গঠিত হয়েছিল লুসাই পাহাড় জেলা কাউন্সিল (বর্তমানে মিজোরাম রাজ্য), নাগা পাহাড় জেলা কাউন্সিল (বর্তমানে নাগাল্যান্ড), খাসি-জয়ন্তীয়া পাহাড় ও গারো পাহাড় জেলা কাউন্সিল (বর্তমানে মেঘালয়); বর্তমানে রয়েছে কার্বি আংলং এবং উত্তর কাছাড় জেলা। এগুলি সবই ছিল পাহাড়ি জনজাতির জন্য। সমতলের জনজাতির জন্য স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠনের আইনি ব্যবস্থা ছিল না। এবার সেজন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সমতলের জনজাতি বড়োদের জন্য একই তফশিলের আওতায় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল তৈরি হল। এই ঘটনা কিছু প্রশ্নকে সামনে এনেছে।

বহু বছর ধরে চলে আসা অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার কারণে যে ন্যায্য ক্ষোভ বড়ো জনগণের মধ্যে পুঞ্জীভূত রয়েছে, স্বায়ত্তশাসন তার কতটুকু সুরাহা করতে পারবে বা আদৌ পারবে কি না। তাছাড়া এই অঞ্চলে বড়োদের সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ, বাকি ৭০ শতাংশই অ-বড়ো। এহেন অবস্থায় স্বায়ত্তশাসনের সামান্য ক্ষমতা আঁকড়ে বড়ো আন্দোলনের ক্ষমতাসীন নেতারা যেভাবে প্রচার করছেন তাতে নেতাদের আশ্বাসবাণীতে মোহাচ্ছন্ন বড়ো জনগণের মনে স্বায়ত্তশাসনকে কেন্দ্র করে যেমন আশার সঞ্চার হয়েছে; তেমনি সাঁওতাল, কোচ, রাজবংশী, নেপালি, অসমীয়া, বাঙালি, বাংলাভাষী অভিবাসী মুসলমান প্রভৃতি ও অন্যান্য অ-বড়ো জনগণ মিলিতভাবে এই অঞ্চলে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের মনে জেগেছে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও শঙ্কা। স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের বৃহত্তর জনসাধারণের অধিকার ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে — এই অভিযোগে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। বড়ো স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় সাঁওতালদের সংখ্যা যথেষ্ট এবং তারা আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি তুললেও বড়ো আন্দোলনের ক্ষমতাসীন নেতারা সেই স্বীকৃতি দিতে রাজি হচ্ছেন না। পৃথকতাবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী বড়োদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই এই অঞ্চলে বড়ো এবং অ-বড়ো বিশেষত সাঁওতালদের মধ্যে সংঘাত ক্রমশ তীব্রতর হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত তার পরিণতিতে মারাত্মক ধরনের ভ্রাতৃঘাতী হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। স্বায়ত্তশাসনের এই সর্বনাশা ঘোষণার পর এই পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। চূড়ান্ত বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়ার ভয় অ-বড়ো জনগণকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

আসামে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় ক্ষমতার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর মানুষদের যে প্রবল বাধা-নিষেধ ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে তাদের আশঙ্কা ও উদ্বেগকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্যদিকে বি এল টি-র সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা স্বায়ত্তশাসন বড়োদের সব গোষ্ঠী একভাবে মানছে না। এন ডি এফ বি নামে একটি সশস্ত্র বড়ো সংগঠন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে, বি টি এ ডি গঠিত হওয়ার পরেও জটিলতা কমেনি। গোষ্ঠী সংঘর্ষ চলছে, প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির পটভূমিতেই সমস্ত বিষয়টি যুক্তিবাদী মন নিয়ে, পূর্বতন অভিজ্ঞতার নিরীখে বিচার করা প্রয়োজন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠনের অভিজ্ঞতা আসামে নতুন নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই পাহাড়ী জনজাতির জন্য বেশ কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গড়ে তোলা হয়েছে। তার পরিণতি কি দাঁড়িয়েছে? দাঁড়িয়েছে এই যে, স্বায়ত্তশাসনের ফলে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সমৃদ্ধি ঘটেছে, ব্যাপক জনগণ কিছুই পায়নি। জনগণের প্রশ্নের সামনে পড়ে নেতৃত্ব বলেছে — ''শুধু স্বায়ত্তশাসনে হবে না, ওটা আন্দোলনের প্রথম ধাপ, এবার পৃথক রাজ্যের দাবি তুলতে হবে।'' এভাবে উগ্র থেকে উগ্রতর বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তায় তারা আপামর জনগণকে বার বার বিভ্রান্ত করেছে। এভাবেই লুসাই, নাগা, খাসি-জয়ন্তীয়া ও গারো পাহাড় জেলা কাউন্সিল থেকে শেষ পর্যন্ত পৃথক রাজ্য মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড গঠিত হয়েছে। কিন্তু তাতে পার্বত্য জনজাতির ভেতরকার মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর লাভ হয়েছে, ব্যাপক সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান সুতীব্র সংকটের কারণে সমগ্র দেশের দরিদ্র মানুষের দুরবস্থার ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সাথে এসব রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের দুর্দশাও বেড়েই চলেছে। স্বায়ত্তশাসন ও পৃথক রাজ্য গঠনের ফলে আসাম খণ্ডিত হয়েছে, সাধারণ মানুষ প্রতারণা ছাড়া কিছুই পায়নি। বর্তমানে বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট গঠনের ফলাফল আলোচনার সময় পূর্বতন অভিজ্ঞতাকেও মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ পূর্বতন অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এই দু'য়ের প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিষয়টি আলোচনার জন্য বড়ো আন্দোলনের গতিধারা এবং বি টি এ ডি গঠনের ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী স্মরণ করতে হবে।

স্বাধীন ভারতে পুঁজিবাদী শোষণ ও তারই স্বার্থে কংগ্রেসী অপশাসনে সাধারণ মানুষের বুকে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ভারতের নানা রাজ্যেই সঠিক বামপন্থী আন্দোলনের অনুপস্থিতির কারণে পৃথকতাবাদের দিকে চলে যায়। কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা পৃথকতাবাদের ধুয়ো তুলে আসামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে প্রবলভাবে বিভ্রান্ত করে ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এই ধারায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে আসাম রাজ্যের পুনর্গঠনের দাবি পর্যন্ত ওঠে। আসামের নানা ধরনের পৃথকতাবাদ, যার দ্বারা জনস্বার্থের অশেষ ক্ষতিসাধন করে মুষ্টিমেয় সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক নেতারা আখের গুছিয়েছে — তার সূচনা করেছিল স্বাধীনতাউত্তর একটানা সুদীর্ঘকাল কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা কংগ্রেস। ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন আসামকে সমতল ও পার্বত্য, এই দুই ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব আনেন। আমাদের দল তখনই তার বিরোধিতা করে বলেছিল — খণ্ড রাজ্য গঠিত হলে জনসাধারণের মৌলিক সমস্যার সমাধান তো হবেই না, বরং তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব বাড়ার বদলে কমবে এবং তাদের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ ও বিভেদের বীজ পোঁতা হবে। পুঁজিবাদী শোষণ থেকে উদ্ভূত জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধান ও বাঁচার দাবিতে শোষিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। (গণদাবী ২০ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৮.৯.৬৭) বিগত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আমাদের দলের বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর, আসামের কংগ্রেসী শাসকদের চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক নীতির ফলে বড়ো জনসাধারণের মনে অন্যায় অবিচার এবং নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ প্রভৃতি প্রশ্নে প্রবল ক্ষোভ জমা হতে থাকে। একে অবলম্বন করে সত্তরের দশকের গোড়ায় প্লেনস ট্রাইবাল কাউন্সিল অব আসাম বড়ো অধ্যুষিত এলাকাগুলি নিয়ে কেন্দ্রশাসিত উদয়াচল রাজ্য গঠনের দাবি তুললেও ব্যাপক বড়ো জনগণ তাতে তেমন সাড়া দেয়নি। তখনও বড়ো জনসাধারণ বৃহত্তর আসামের মধ্যে থেকেই নিজেদের বিকাশ অব্যাহত রাখার কথা ভাবছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস, জনতা এবং সর্বশেষে এজিপি প্রভৃতি শাসকদলগুলি বড়ো জনগণের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা, বৈষম্য এবং দমন-পীড়নের পথ বেছে নেয়। তার বিরুদ্ধে বড়ো জনগণের তীব্র বিক্ষোভকে ব্যবহার করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ উস্‌কে তুলতে পেরেছে — সেদিন তারা তা পারেনি। আসামের তৎকালীন শাসকেরা যদি বড়ো জনগণের ন্যায্য ক্ষোভকে মর্যাদা দিয়ে তাঁদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করত তবে পরিস্থিতি অন্যরকম হত। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলগুলি সে পথে যায়নি।

সত্তরের দশকের শেষে 'বিদেশি বিতাড়নে'র নামে আসামে যে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, পরবর্তীকালে গোটা আসাম জুড়ে নানা ধরনের পৃথকতাবাদী খণ্ড চিন্তার জোয়ার সৃষ্টি তারই মারাত্মক ফল। আসাম আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যেভাবে 'অসমীয়া জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন', 'আসাম অসমীয়াদের জন্য' বা এই ধরনের অন্যান্য স্লোগানে আকাশবাতাস মথিত করে তোলে, তার পরিণামে আসামে বসবাসকারী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মনেও পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার সর্বনাশা মানসিকতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয় এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তা, গোষ্ঠী চিন্তা, খণ্ড চিন্তা আসামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে ছেয়ে ফেলে।

আসামের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী আন্দোলনের বাতাবরণে নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অনৈক্যের বিষময় পটভূমিতে ১৯৮৭ সাল থেকে পৃথক রাজ্যের দাবিতে যখন বড়ো আন্দোলন গড়ে ওঠে তখন উগ্র জাতিদম্ভে অন্ধ অসম গণপরিষদ সরকার বড়ো জনগণের অর্থনৈতিক এবং ভাষা-সংস্কৃতির প্রশ্নে ন্যায়সঙ্গত আশাআকাঙ্ক্ষাকে যথার্থভাবে স্বীকৃতি দিয়ে পৃথকতাবাদী শক্তির হাত থেকে বড়ো জনগণকে মুক্ত করার বাস্তবসম্মত পথে না গিয়ে চূড়ান্ত দমনপীড়নের পথ বেছে নেয়। আসাম যে একটি বহু ভাষাভাষী রাজ্য, বলতে গেলে ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ; অন্যান্য সংখ্যালঘুর কথা বাদ দিলেও আসামের আদি বাসিন্দা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মনে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকাটা যে স্বাভাবিক — এই বাস্তব সত্যকে আসাম আন্দোলনের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী নেতৃত্ব অস্বীকারের চেষ্টা করে। নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আদানপ্রদান ও মিশ্রণের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে অন্যান্য সকলকে জোর করে অসমীয়া বানাবার জন্য তাদের চেষ্টা শুধু অন্যায় নয়, এটা অসমীয়া ভাষার বিকাশের পথেও অন্তরায় সৃষ্টি করে। '৮৫ সালে ক্ষমতায় বসে তারা স্কুলে অসমীয়া পড়ানো বাধ্যতামূলক করে যে ফতোয়া জারি করে তা বড়ো জনগণের ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। (দ্রঃ এসইউসিআই-এর অসমীয়া মুখপত্র গণমুক্তি ৮.১.০৪) এর ফলে পৃথকতাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে বড়ো জনগণকে প্রভাবিত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (আসু) আদলে গড়ে ওঠা অল বড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আবসু)র উদ্যোগে বড়ো আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়। আমাদের দল এই জটিল ও সংকটময় অবস্থার কারণগুলি সঠিকভাবেই বিশ্লেষণ করেছিল। '৮৯ সালে বড়ো আন্দোলন সম্পর্কে এস ইউ সি আই-এর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে দলের আসাম রাজ্য কমিটি সুস্পষ্টভাবে দেখায় — বড়ো আন্দোলন আসাম আন্দোলনের সর্বনাশা ভাবধারাতেই গড়ে উঠেছে। রাজ্যের ক্ষমতায় বসে আসাম আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষায় জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে এবং অসম গণপরিষদের সরকারের সঙ্গে অতীতের কংগ্রেসী শাসনের কোন মৌলিক প্রভেদ নেই (দ্রঃ আসাম রাজ্য কমিটি প্রকাশিত 'বড়ো আন্দোলন প্রসঙ্গত' পুস্তিকা ১৯৯০)

পরবর্তীকালে যখন কংগ্রেস আবার আসামে সরকারি ক্ষমতায় আসে, তখন তারাও একই দমননীতি চালিয়ে যায়। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বড়ো আন্দোলন আরও তীব্র হতে থাকে। শেষপর্যন্ত বড়ো নেতৃত্বের সঙ্গে শাসকদলকে আপসে আসতে হয় এবং দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৯৩ সালে আসাম বিধানসভায় আইন পাস করে সংবিধানের ৭ম তফশিলের আওতায় বড়োল্যান্ড স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ (বি এ সি) গঠিত হয়। আসু'র আন্দোলনের শুরুর দিন থেকে, পরবর্তীকালে আবসুর আন্দোলনেরও সূচনা থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই দেখিয়েছে — যেহেতু আমাদের সমস্ত সমস্যার — শুধু আর্থিক সমস্যা নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সংখ্যালঘু সমস্যা সবকিছুর মূলে আছে পুঁজিবাদী শোষণ, পুঁজিবাদই আর্থ-রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক সমস্যার জন্মদাতা; তাই পুঁজিবাদকে মূল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে না তুলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন, বা পৃথক রাজ্য গঠনের দ্বারা জনজীবনের মূল সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান সম্ভব নয়। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম একসময় স্বায়ত্তশাসিত ছিল, পরে পৃথক রাজ্যও হয়েছে, কার্বি আংলং উত্তর কাছাড় জেলার স্বায়ত্তশাসন রয়েছে — সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু কোন জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের মূল সমস্যাগুলির কিছুমাত্র সমাধান হয়নি। 'আবসু' আন্দোলন ও বড়োল্যান্ড স্বায়ত্তশাসিত পরিষদও বড়ো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হল। কারণ প্রথমত, যেকথা আগেই বলা হয়েছে, জনগণের সমস্ত

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাষ্ট্র দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছে
শিশুরা বিপন্নতার গহ্বরে

আমাদের শিশুদের কি বিশ্বায়নের জন্য মাশুল দিতে হচ্ছে? উত্তরপ্রদেশের আম্বেদকর নগরের আকবরপুর ব্লকের ভূমিহীন দলিতদের জিজ্ঞেস করুন — তারা বলবে, হ্যাঁ, দিতে হচ্ছে। তারা বলবে, কীভাবে '৯০ এর দশকে খাদ্যশস্যের দামবৃদ্ধি, গণবণ্টন ব্যবস্থার সংকোচন এবং বিপুল সংখ্যায় চাকরি কমে যাওয়ায় তাদের শিশু সন্তানদের বাধ্য হয়ে মজুরি খাটতে হচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য এই চাপ নেওয়াই শুধু নয়, ঐ দশকে তাদের স্কুল ছাড়তে হয়েছে, সরকারি স্কুলে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত কমেছে, ১০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ৮টি বন্ধ হয়ে যাওয়া, এমনকী, ১৫টি বেসরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটেছে। যাদের টাকা আছে বেসরকারি ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসার দরজা কেবল তাদের জন্যই খোলা রয়েছে।

অনেকে বলছেন, বিশ্বায়ন এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ক্রেতাদের বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু এই সুযোগ কাদের জন্য? আকবরপুরের শিশুদের কাছে বিশ্বায়নের অর্থ কী? তাদের কাছে বিশ্বায়নের অর্থ হল চাকরি হারিয়ে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়া, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকীকরণ। কেউ কেউ বলেন, স্বাধীনতার পর ভারতীয় শিশুদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, উন্নত জীবনের আকাঙ্খা বেড়েছে, শিশুমৃত্যুহীনতা এবং স্কুলে শিশুদের ক্রমবর্ধমান হারে নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটছে। আবার যে ২০ লক্ষ ভারতীয় শিশু এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায় — সেই আলোকেও বিশ্বায়নকে দেখতে পারি। ধনীরা তাদের শ্রেণীস্বার্থে বিশ্বায়নে সুফল দেখে। আর গরিবরা দেখে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার দুঃস্বপ্ন। ভারতের প্রতিটি রাজ্যেরই এই ছবি।

প্রচুর খাদ্য মজুত রয়েছে এমন দেশেও ন্যূনতম পাঁচ বছর বয়স্ক ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ছেলেমেয়ে পেটভরে খেতে পায় না, ১০ কোটি পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে পানীয় জল পায় না; প্রতি দশ জন শিশুর মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী, ১ কোটি ১০ লক্ষ গৃহহীন ছেলেমেয়ে অনাদরে অবহেলায় রাস্তায় থাকে।

দেশীয় বাজারে বিনিয়োগ না করে এবং গরিবদের সুরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে যখন দেশীয় অর্থনীতি বিশ্ববাজারের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল, দেখা গেল সারা বিশ্বেই যারা এর সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার — শিশুরা তাদের অন্যতম। এই ভয়াবহতা সেখানেই বেশি যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল নিয়ে ব্যবসা চলছে — যেমন ভারতবর্ষে।

ভারত, কেনিয়া এবং বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার খরচ বাড়তে থাকায় পরিবারের কর্তারা শিশুদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। মালয়ে ফি বৃদ্ধির সাথে সাথেই ছাত্রসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। আবার ১৯৯৪ সালে যখন ফি কমানো হল ছাত্রসংখ্যা ৫০ শতাংশ বেড়ে গেল। '৮০-র দশকে ভারত সরকার সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ব্যয় করত, অর্থনৈতিক সংস্কারের দশকে তার সামান্য অংশই ব্যয় করে। এখন গরিব জনগণের বিরাট অংশ আর গরিব নয় — একথা বলে গণবণ্টন বা রেশনিং ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করে কেবল দরিদ্রতমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হল। এদেশে জনগণের (শিশুসহ) সিংহভাগই কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সার, কীটনাশক বিষ ও বীজের উচ্চহারে দামবৃদ্ধির ফলে তাদের বেঁচে থাকাই আজ দুরূহ হয়ে উঠেছে।

এক দশক আগেও কৃষকরা বিক্রি করতে গিয়ে ফসলের যে দাম পেত, সেই দাম আজ পাচ্ছে না — তার একটা ভগ্নাংশ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। অপরদিকে খাদ্যদ্রব্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে (চালের ক্ষেত্রে ১০.২% বেড়েছে)। ফলে গ্রামীণ গরিবদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বঞ্চনার সবচেয়ে বেশি শিকার হচ্ছে মহিলা ও শিশুরা। ঠিকা ও চুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানের নীতি গ্রহণের ফলে শিশুদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। বড়দের নিয়মিত কাজের সুযোগ না থাকায় বেঁচে থাকার জন্য জীবনযাত্রার মান নামাতে হচ্ছে এবং শিশুদেরকেও মজুরি খাটতে পাঠাতে হচ্ছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে তুলোর বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য যখন পারিবারিক খামারগুলিকে কর্পোরেশনে আনা হল তখন বহু মানুষ কাজ হারায়। এই অবস্থায় তাদের পরিবারের শিশুরা স্কুল ছেড়ে কাজে নামতে বাধ্য হয়। সেখানে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০০ জন শিশুর ৬০ শতাংশই তুলো বীজ উৎপাদনের কাজ করছে। বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকরা বাড়ি ঘর এবং শিশুদের দেখাশোনার জন্য স্ত্রীদের ফেলে রেখে কাজের জন্য ভিন্ দেশে ব্যাপক সংখ্যায় পাড়ি দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে একই চিত্র দেখা যায়। ছোট ছোট মেয়েরা পড়াশুনা ও শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে শিশু প্রতিপালন এবং গৃহস্থালীর কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থবরাদ্দ আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বাড়ছে। কিন্তু যা বরাদ্দ হচ্ছে তা স্কুল-ছুট শিশুদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফলে নিম্নমানের এবং কম বেতন দেওয়া আধা-শিক্ষক দ্বারা লক্ষ লক্ষ প্রথম প্রজন্মের শিশুদের শিক্ষাদান করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো আবার রাজ্যের শিক্ষকহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক ১ হাজার টাকায় চুক্তিশিক্ষক নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে। যারা দোকান-ব্যবসা করেও শিক্ষকতা করতে পারবে। এই ধরনের স্কুলের শিশুরা প্রথাগত শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেও পারবে না, দারিদ্র্যবৃত্তের বাইরেও আসতে পারবে না।

সারা দেশজুড়ে যখন বেসরকারি স্কুল গজিয়ে উঠছে, সরকারি স্কুলগুলি গুণগত মান না বাড়িয়ে অযোগ্যতার জন্য বন্ধ হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, ১৯৯৮ সালে আমেদাবাদে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে এবং স্কুলের জমি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। ১৯৯৯ সালে ইন্দোরে ৩০টি স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে ১৯০০ স্কুল উঠে গেছে। সরকারি হিসাবেই এরাজ্যে ৭ লক্ষ শিশু স্কুলে যায় না। সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সুলভ করার পরিবর্তে গরিবের চিকিৎসার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ করে চলেছে।

সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচের এক-চতুর্থাংশ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে, বাকি তিন-চতুর্থাংশ জনগণের কাছ থেকে আদায় করা হবে। এই অবস্থায় গরিবরা চিকিৎসা নিতে এসে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এরকম ৪০টি ক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে অথবা ঋণ নিয়ে হাসপাতালের চার্জ মেটাতে হচ্ছে। সরকারি

সাতের পাতায় দেখুন

টাকা নয়ছয়ে কেউ পিছিয়ে নেই

একের পাতার পর

ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের আচরণবিধি পালন করবে কেন্দ্রীয় সরকার।' এর দ্বারা প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করে নিলেন, নির্বাচনবিধি অনুযায়ী এভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া বেআইনি, কিন্তু যেহেতু নির্বাচন ঘোষণা এখনও হয়নি, সরকার সেই ফাঁকটার সুযোগ নিয়ে জনগণের শত শত কোটি টাকা খরচ করে চলেছে একথা জনগণকে বোঝাবার জন্য যে, বিজেপি শাসনে জনগণ সুখে আছেন। জনগণ যদি সত্যই সুখে থাকেন, সেটা তো তারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন, সেখানে জনগণেরই টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে কেন?

এটা যদি বিজেপি তার দলীয় টাকায় করত, তবে তাকে শুধু মিথ্যা প্রচার বললেই চলত। বিজ্ঞাপন দেওয়া চলছে সরকারি কোষাগার ভেঙে অর্থাৎ জনগণের টাকায়। কত টাকা এর জন্য ব্যয় হচ্ছে? সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি, সরকার দেয়নি। তবে নানা মহলের হিসাবে তা ৪৫০ থেকে ৫০০ কোটি টাকার কম হবে না। কখন এটা করা হচ্ছে? যখন সরকার বলছে, চাল-গম-কেরোসিন-রান্নার গ্যাস-পেট্রল-ডিজেলে ভরতুকি দেওয়া যাবেনা; যখন টাকা নেই বলে সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করছে, যখন টাকার অভাব মেটাবার নামে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচে দেওয়া হচ্ছে, যখন সরকারি ঋণ দাঁড়িয়েছে বিশাল অঙ্কের, যার সুদ দিতে ব্যয় হচ্ছে বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকার উপর। সর্বোপরি দেশের ২১ কোটির উপর মানুষ যখন ধারাবাহিক ক্ষুধায় ভুগছেন। ('গুটুথ'-এর রিপোর্ট)।

যেসব রাজ্যে কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছে সেখানে তারাও জনগণের টাকা ওড়াচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারও একইভাবে জনগণের টাকায় 'সরকারি সাফল্যে'র বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে। এমন একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে — "একদিকে কৃষি, ভূমিসংস্কার, গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েতি রাজ — অন্যদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ পরিস্থিতি, নগর উন্নয়ন ও আবাসন গড়ার মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের ছবি স্পষ্ট।" (গণশক্তিতে সরকারি বিজ্ঞাপন ৮-২-০৪)। বিজ্ঞাপনের এই দাবিগুলির সাথে রাজ্যের জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতা কি আদৌ মেলে? চিত্রটা ঠিক উল্টো বলেই বিজ্ঞাপনের এত বাহার। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে কায়দায়, 'মহিলা', 'ছাত্র', 'চাষী' ধরে ধরে তাদের জীবনে 'সাফল্য ও সুখের' বিজ্ঞাপন দিচ্ছে; সি পি এম ফ্রন্ট সরকারও একই কায়দা অনুসরণ করছে। আরও লক্ষণীয় যে, রাজ্য সরকারের এই ভোট বিজ্ঞাপনগুলির অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে সি পি এমের দলীয় মুখপত্র গণশক্তি পত্রিকায় (৭, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি গণশক্তি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দলের হয়ে ভোট প্রচারে সরকারি টাকা শুধু ব্যয় করা হচ্ছে তাই নয়, সেই টাকাও যাতে দলের কাগজ পায়, তাও সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতোই সি পি এম সরকারও আত্মপ্রচারের জন্য সরকারি টাকায় টি ভি চ্যানেলগুলিকে ব্যবহার করছে। করছে সেই সরকার ও শাসক দল, যারা 'টাকা নেই' ধুয়ো তুলে প্রায় প্রতিদিন জনগণের ঘাড়ে কর-দরের বোঝা চাপাচ্ছে। যারা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের 'বিজ্ঞাপন'-এর বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করছে। ফলে নৈতিকতার প্রশ্নে বিজেপি'র থেকে পিছিয়ে নেই সি পি এমও। তাদের এই দ্বিচারিতা একেবারে নগ্ন হয়ে যাওয়ায় ১৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, তিনি নাকি সরকারি বিজ্ঞাপন দিতে নিষেধ করেছেন। যদিও এরপরেও টি-ভি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়নি।

এ ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসও পিছিয়ে নেই। কলকাতা পুরসভা তাদের দখলে থাকার সুবাদে তারাও জনগণের টাকায় গড়ে তোলা পুর তহবিল দেদার খরচা করে তৃণমূল পুরসভার কীর্তি ও সাফল্যের ঢালাও প্রচার চালাচ্ছে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে। এক্ষেত্রেও ঘটনা হল, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা পুরসভা কলকাতা শহরের যে এত ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে, কলকাতার নাগরিকরাই তা জানেন না। রাজ্য সরকার যেমন কোথাও কোনও প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানেরও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সহ সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে 'উন্নয়ন' দেখাচ্ছে, কয়লা দপ্তরের মন্ত্রীত্বের সুযোগ নিয়ে তৃণমূল নেত্রীও কয়লা দপ্তরের টাকায় নিজের বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন, মেয়রও সেটাই করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে সাধারণ মানুষ যখন খাদ্য-শিক্ষা-চিকিৎসার অভাবে ধুঁকছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কাজ হারাচ্ছে, না খাওয়া শ্রমিক চাষী আত্মহত্যা করছে, তখন সরকারি দলগুলো জনগণের টাকা নিয়ে নয়ছয় করে যাচ্ছে। এরাই আবার বলছে, জনগণ ভোট দিলে সরকারে বসে তারা জনকল্যাণের বন্যা বইয়ে দেবে। জনগণ কি তা বিশ্বাস করবেন?

সিপিএম ফ্রন্ট সরকার

তৃণমূল পুরসভা

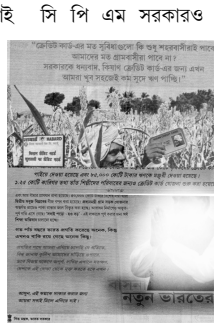

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার

‘আমাদের আফগানিস্তান এখন শ্মশান’

[৩০ বছরের সাহার সাবা মাত্র ৯ বছর বয়স থেকেই আফগানিস্তানের ‘রেভলিউশনারি অ্যাসোসিয়েশন অফ উইমেন অফ আফগানিস্তান (RAWA)-এর সদস্য। এখন পেশোয়ারে উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করছেন। সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন। একের পর এক বর্বর শাসকবাহিনী ও যুদ্ধের কবলে পড়া আফগান মহিলাদের যন্ত্রণার কাহিনী এবং তাদের অন্ধকার জীবনে সামান্য আশার আলো এনে দেওয়ার জন্য RAWA কীভাবে কাজ করছে — সে কথা এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন। নিচের সাক্ষাৎকারটি গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, ‘টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।]

প্রশ্ন ঃ তালিবানি শাসনে মেয়েদের প্রকাশ্যে আসা নিষিদ্ধ ছিল, RAWA তখন কীভাবে কাজ করেছে?

উত্তর ঃ সেই সময় আফগানিস্তানে মানুষের সমস্যা নিয়ে একমাত্র আমরাই কথা বলেছি। গোপনে মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা ছেলেদেরও পড়াবার ব্যবস্থা করেছি, বিধবাদের অর্থ সাহায্য করেছি, তাদের জন্য রোজগারের বন্দোবস্তও করে দিয়েছি। ধর্মের নাম করে তালিবানরা যে নৃশংসতা চালাত, মানুষের চোখের সামনে তা আমরা তুলে ধরেছি। তালিবানি হুকুমে নৃশংসভাবে মহিলাদের হত্যাকাণ্ডের বহু ঘটনা গোপন ক্যামেরার সাহায্যে আমরা লেন্সবন্দী করেছি। একটি ঘটনার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। সাত সন্তানের জননী এক মহিলাকে স্বামী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল তালিবানরা। মহিলাটির স্বামীর বাড়ির লোকজন তাঁকে ক্ষমা করে দিলেও তালিবানরা ঐ মহিলাকে করুণা দেখাতে রাজি হল না। ১৫ হাজার মানুষের চোখের সামনে অভিযুক্ত মহিলাটিকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। সেখানে নারী ও শিশুরাও উপস্থিত ছিল। তাঁর শিশু সন্তানরা তাদের মায়ের জন্য চিৎকার করে কাঁদছিল। সম্পূর্ণ ঘটনাটির ছবি তুলে রেখেছিলাম আমরা। আমাদের তোলা ছবি দেখে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ তালিবানরা প্রায়ই দাবি করত যে তাদের আমলেই মহিলারা নাকি সবচেয়ে বেশি সুরক্ষা ভোগ করেছে — এ দাবি কি সত্য?

উত্তর ঃ জেলবন্দী একজন মানুষের কাছে ‘সুরক্ষা’ শব্দটির কোনো তাৎপর্যই নেই। তবে একথা ঠিক যে, আগেকার যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীগুলি যেভাবে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো লুঠপাট এবং ধর্ষণ চালাতো, তার তুলনায় তালিবানদের শাসনকাল নিরাপদ ছিল। অবশ্য তালিবান শাসকরা আমাদের উপর যে অমানবিক বিধিনিষেধ চাপিয়েছিল, তার নিরিখে ঐ তথাকথিত ‘সুরক্ষা’ বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা দিতে পারে না। সেই আমলে মহিলাদের এমনকী ডাক্তার দেখানোর অধিকারটুকুও ছিল না।

প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিগতভাবে এইসব ঘটনা আপনার ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

উত্তর ঃ আমার কাছে পরিস্থিতি ছিল চূড়ান্ত যন্ত্রণার। জীবনের সমস্ত অর্থই প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল। মহিলাদের মনোজগতে প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল। আমেরিকার মানবাধিকার কর্মী একদল ডাক্তার একবার সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছিলেন, ৯৮ শতাংশ আফগান মহিলা ভয়ঙ্কর রকম মানসিক গোলযোগে ভুগছেন। আমাদের RAWA সংগঠনটির ক্ষমতা সীমিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা মহিলাদের সুস্থ করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছি। সন্তানদের মুখে দু-মুঠো খাবার তুলে দেবার আশায় যেসব মহিলারা দেহ বিক্রির পথে নেমেছিলেন, তাঁদের অনেককেই আমরা ফিরিয়ে এনেছি।

প্রশ্ন ঃ RAWA-র সদস্যরা কীভাবে নিজেদের কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করতেন?

উত্তর ঃ আমরা আমাদের প্রকৃত নাম এখনও ব্যবহার করি না, আমাদের কোনো ফটো যাতে ছাপা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখি, এমনকী আমাদের কে কোথায় থাকে — তা নিজেরাও আমরা জানি না। আমরা এক কঠিন ও ভয়ঙ্কর জীবনের মধ্যে বেঁচে রয়েছি। ধরা পড়ে গেলে RAWA-র সদস্য হওয়ার অপরাধে আমাদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে। তবে আমি যে কোনও ধরনের পরিণতির জন্য প্রস্তুত।

প্রশ্ন ঃ মার্কিন হস্তক্ষেপের ব্যাপারে কী বলছেন? হামিদ কারজাই-এর শাসনে দেশের হাল কি ফিরেছে?

উত্তর ঃ আদৌ না। বস্তুতপক্ষে, আমেরিকার এই সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের ফল হিসাবে সমস্ত বর্বর ও ক্রিমিনাল যুদ্ধবাজরা আবার ফিরে এসেছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা মহিলাদের প্রতি এদের এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। এরা মহিলাদের লেখাপড়া শিখতে দিতে রাজি নয়, এমনকী মহিলাদের ডাক্তার দেখানোর অনুমতিও এরা দেয় না। মিঃ কারজাই-এর হাতে কোনো ক্ষমতাই নেই — বস্তুত তিনি মার্কিন শাসকদের হাতে বন্দী। আমাদের দেশের পুরুষ কিংবা মহিলাদের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও আগ্রহই নেই। অতীতে ওরাই তালিবান শাসকদের আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল; এখন আবার ‘জেহাদি’ এবং যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীগুলিকে চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে আমেরিকা আমাদের শান্তি, গণতন্ত্র বা সুস্থিতি — কিছুই দিতে পারেনি।

প্রশ্ন ঃ এই অবস্থায় আপনার মতে কী করা উচিত?

উত্তর ঃ যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীগুলির হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া দরকার; অথচ আমেরিকা এই গোষ্ঠীগুলিকেই সমর্থন করছে। আফগানিস্তান প্রসঙ্গে ভারতের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ‘নর্দার্ন অ্যালায়েন্স’কে ভারত সমর্থন দিয়েছে। আমার মতে এ এক মারাত্মক ভুল। ভারতবর্ষ নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে দাবি করে। এদিকে ‘নর্দার্ন অ্যালায়েন্স’ হল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী শক্তি। এই অবস্থায় ‘নর্দার্ন অ্যালায়েন্স’কে সমর্থন করা ভারতের পক্ষে অদ্ভুত নয় কি?

প্রশ্ন ঃ মার্কিন হস্তক্ষেপে আফগান মহিলারা স্বাধীনতা পেয়েছেন — লরা বুশের এ হেন দাবির কথা শুনে আপনার কী অনুভূতি হয়েছিল?

উত্তর ঃ আমার প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। আমি অপমানিত বোধ করেছিলাম। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার আগে পর্যন্ত এতগুলো বছর তারা কোথায় ছিল? সেই সময় আমাদের অবস্থা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল কি? দু-একজন বোরখাবিহীন মহিলার ছবি দেখিয়ে মার্কিনী প্রচারমাধ্যমের পক্ষে প্রচার করা খুবই সহজ যে সমস্ত আফগান মহিলাই এখন মুক্তির স্বাদ অনুভব করছেন। এদিকে চিকিৎসার অভাব চরমে ওঠায় আমাদের ছেলেমেয়েরা মারা যাচ্ছে। আমাদের কোনও হাসপাতাল নেই, চিকিৎসার কোনরকম বন্দোবস্ত নেই, এমনকী ডাক্তারও নেই। প্রায় ৪ হাজার সাধারণ নাগরিক মার্কিনী বোমাবর্ষণে মারা গেছে। মার্কিনীরা যে ‘পুনর্গঠনের’ কথা বলেছিল — কোথায় গেল তাদের সেই প্রতিশ্রুতি? যেই মার্কিন কোম্পানিগুলো দেখল ইরাক থেকে টাকা লোটা আরো বেশি সহজ, অমনি তারা আমাদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল। এতদিন পরেও আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ওসামা বিন লাদেন ও আলকায়দাকে পাকড়াও করা। যাদের একদা তারা লালন পালন করেছে, তারাই আজ মার্কিনীদের চোখে ‘সন্ত্রাসবাদী’ বনে গেছে।

প্রশ্ন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার ও নারীর অধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলির কাছ থেকে আপনারা কী ধরনের সাড়া পান?

উত্তর ঃ আফগানিস্তানে কী হচ্ছে না হচ্ছে, দুর্ভাগ্যবশত তার খবর মার্কিনীরা বিশেষ একটা রাখেন না, এসব ব্যাপারে তাঁদের খুব একটা আগ্রহও নেই। দেখে মনে হয়, মানুষের যেন এসব বিষয় সম্পর্কে জানার ইচ্ছেটাই নেই। প্রচারমাধ্যমগুলিও এখন আমাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল এখন ইরাক। আমাদের আফগানিস্তান এখন শ্মশান, আর আমাদের সন্তানরা ইউরেনিয়াম বিষে মারা যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কী করে আপনার আশাকে বাঁচিয়ে রাখেন?

উত্তর ঃ আশা ছেড়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না, তবে আমাদের শাসকদের চেহারা দেখে মাঝে মাঝে আমার আতঙ্ক হয়। মৌলবাদীদের খতম তালিকায় আমার নাম আছে। তবে সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমি আমার সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আফগানদের সামনে এখন একমাত্র পথ হল বর্তমান শাসকদের উৎখাত করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। আমার জীবন আমি সেই কাজেই উৎসর্গ করেছি।

দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক

দক্ষিণ কোরিয় সরকার ইতিমধ্যেই ৪৬৪ জন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার সেনাকর্মীকে ইরাকে পাঠিয়েছে। এবার আরও ৩ হাজার যুদ্ধসেনাকে ইরাকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্প্রতি সে দেশের সংসদে ১৫০-৫৫ ভোটে পাস হয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে সে দেশের শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষই। বিরোধিতা করেছেন বামপন্থী ও উদার গণতন্ত্রীরা। সংসদে এই প্রস্তাবটি পাস হওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে তীব্র গণবিক্ষোভ ফেটে পড়েছে। প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটির দিন, ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক সংসদের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। সেখানে শ্রমিকদের সঙ্গে রায়ট পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ বেধেছে। এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ যেদিন দক্ষিণ কোরিয় যুদ্ধ সেনাদের প্রথম কিস্তি ইরাকে যাবে, সেদিন এর প্রতিবাদে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছে।

(এ পি, ডেকান হেরাল্ড, রয়টার্স ১৪-২-০৪)

বুলগেরিয় সেনারা ইরাকে যেতে চাইছে না

পোলিশ সেনাপতির অধীনে ৫০০ বুলগেরিয় সেনা এখন বাগদাদ থেকে ৭০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কারবালাতে মোতায়েন রয়েছে। একটি পোলিশ সেনাচৌকিতে পোলিশ সেনাদের পাশাপাশি বুলগেরিয় সেনারাও রয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর সেই সেনাচৌকিতে একটি আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে যে ১৯ জন মারা যায়, তার মধ্যে ৫ জন বুলগেরিয় সেনা। ২৬ জন বুলগেরিয় সেনা আহত হয়েছে, এদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইরাকে সেনা পাঠানোর বিরুদ্ধে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে কারবালাতে কর্মরত ৫০০ সেনার বদলি হিসাবে অপর ৫০০ জন সেনার ইরাক রওনা হওয়ার কথা ছিল ১৭ জানুয়ারি। যে ৫০০ জনের ইরাকে যাওয়ার কথা তাদের মধ্যে জনা তিরিশেক সেনা সরাসরি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের পক্ষে ইরাক যাওয়া সম্ভব নয়। (ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড [নিউ ইয়র্ক] ২৯-১-০৪)

১০০ বন্দীকে মুক্ত করল গেরিলা যোদ্ধারা

প্রকাশ্য দিবালোকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির মধ্যে সুরক্ষিত ইরাকি পুলিশ থানার ওপর চারদিক থেকে একসঙ্গে অত্যন্ত সাহসিক আক্রমণ চালিয়ে ৭০ জন গেরিলা যোদ্ধা ১০০ বন্দীকে মুক্ত করেছে।

গত এপ্রিল থেকে এ পর্যন্ত ৬০০ পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষী গেরিলা যোদ্ধাদের হাতে নিহতে হয়েছে। পশ্চিম বাগদাদের ফালুজা শহরের এই সামরিক ঘাঁটিতেই দুদিন আগে পশ্চিম এশিয়ার প্রধান মার্কিন কমাণ্ডার জেনারেল জন আবিজাইদকে লক্ষ করে রকেটচালিত গ্রেনেড ছুঁড়েছিল গেরিলা যোদ্ধারা। খুব অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে যান। কড়া সামরিক সুরক্ষায় ঘাঁটি পরিদর্শনে এসে প্রধান কমাণ্ডারের আক্রান্ত হওয়ায় ঘটনা মার্কিন দালাল ‘ইরাকি শাসকদের’ মধ্যে এমন আতঙ্ক ছড়িয়েছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে তৈরি ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যরাও মার্কিন চক্রের পছন্দ করা সদস্যদের নিয়ে নয়া ইরাক সরকার গঠনের মার্কিন পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে। গেরিলা যোদ্ধারা সম্প্রতি ঘোষণা করেছে কেবল মার্কিন সেনা নয়, সেই সাথে মার্কিন দালালদের ওপরও আক্রমণ চলবে। ফলে মার্কিন পছন্দের ইরাকি নেতারা এখন শিয়া কাউন্সিলের মতই বলছে — জাতীয় স্তরে সাধারণ নির্বাচন করে সরকার গঠন করতে হবে। ইরাকি জনগণের প্রবল বিরোধিতা ও সশস্ত্র স্বাধীনতার লড়াইয়ের ফলে পুতুল সরকার বসাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। ইরাকে তারা এখন বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বসেছে। না পারছে বসতে না পারছে নামতে। (সূত্র ঃ এ পি’র রিপোর্ট, টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ১৫-২-০৪)

বন্ধ চা-বাগান অধিগ্রহণ কর

একের পাতার পর

সরকার, কি বিজেপি সরকার — সব সরকারেরই এখানে এক রা। জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে তারা মালিককে ভর্তুকি দেয়। এবার বিজেপি সরকারও তাদের জন্য একগুচ্ছ সুবিধা ঘোষণা করেছে।

নৈরাজ্য ঠেকাতে চা-য়ে 'নিলাম' ব্যবস্থা চালু করা হয়। আগে ৭৫% চা নিলামে পাঠানো বাধ্যতামূলক ছিল। মালিকদের আবদার মেনে এখন ৪০% নিলামে আসে। 'নিলাম ব্যবস্থা' নানা দুর্নীতি ও ধোঁকাবাজিতে বিপর্যস্ত। সবই মালিকদের অবদান! টি-বোর্ডের কাছে চা-উৎপাদনের সঠিক কোন তথ্যই নেই। কেনিয়াতে ১০০%, শ্রীলঙ্কায় ৯৫% চা নিলামে বিক্রি হয়। এদেশে নিলামের ওপর নিয়ন্ত্রণটুকুও নেই। কংগ্রেস ও বিজেপি সরকার এই হাল করেছে চা-শিল্পের!

ওয়েস্টবেঙ্গল টি ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন

চা-বাগান বাঁচাতে ১৯৭৬ সালে রাজ্য সরকারের অধীনে গড়া হয়েছিল 'ওয়েস্টবেঙ্গল টি ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন'। এই কর্পোরেশন ইতিপূর্বে গুটিকতক বাগান অধিগ্রহণ করেছিল। তারই একটি হল ডুয়ার্সের হিলা চা-বাগান। সি পি এমের মুখপত্র 'গণশক্তি' বলছে, ''এই বাগানটি রাজ্য সরকারের এক সংস্থা ওয়েস্টবেঙ্গল টি ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন চালাচ্ছে। সাফল্যও অর্জিত হয়েছে '৯১ এর পর থেকে। উৎপাদন বেড়েছে ৭১ শতাংশ হারে।'' (২৪-১২-২০০৩) এই বাগানে গত আর্থিক বছরে লাভ হয়েছে কম করেও ২০ লাখ টাকা। তাহলে, সরকারি অধিগ্রহণে লাভ হয় না — এটা কি যথার্থই সত্যি কথা?

কর্পোরেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান পরিতোষ দত্ত রাখ-ঢাক না করেই গণদাবীর সংবাদদাতাকে বলেছেন, 'আমি বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থক। কিন্তু আমি এখন হতাশ।' তিনি বলেন, 'চায়ের বাজার নেই — এটা বাজে কথা। নানা গল্প শোনানো হচ্ছে, সবই বাজে কথা। আসলে এসব বলে হাউসগুলো সমস্ত দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্টও বাতিল করতে চাইছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থেকে পুরো সুবিধা নিচ্ছে।' রাজ্য সরকার বাগান অধিগ্রহণ করে কর্পোরেশনের মাধ্যমে অবশ্যই লাভজনকভাবে চালাতে পারে — এই বিষয়ে চেয়ারম্যানের কোনো সংশয়ই নেই। তিনি বলেন, চায়ের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ব্যুরোক্রেসি, দুর্নীতি-স্বজনপোষণ দূর করতে পারলে ভালভাবেই বাগান চালানো সম্ভব, শ্রমিকদের আরো সুবিধা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় তিনি হতাশা, পদত্যাগের কথাও ভেবেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার তার দায়িত্ব পালন না করে যেভাবে শ্রমিকদের ক্রমাগত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, সর্বোপরি 'অনাহারে মৃত্যু হয় নি' বলে যেভাবে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছে তাকে নিষ্ঠুর বললেও কম বলা হয়।

তাই আজ শ্রমিকদের বুঝতে হবে কি কংগ্রেস, কি বিজেপি, কি সি পি এম-ফ্রন্ট — কেউই তাদের দুরবস্থা প্রতিকারে কার্যত কিছু করছে না, করবে না। এস ইউ সি আই এবং নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন যে সংগ্রামী মঞ্চ গড়ে তুলেছে তাকে শক্তিশালী করে লড়াইয়ের আগামী কর্মসূচিতে সামিল হতে হবে। লড়াই এর পথেই রক্ষা করতে হবে অর্জিত অধিকার, বিস্তৃত করতে হবে গণতান্ত্রিক অধিকার।

বড়োল্যান্ড প্রসঙ্গে

তিনের পাতার পর

সমস্যার মূলে রয়েছে যে পুঁজিবাদ, সেই পুঁজিবাদকে বজায় রেখে স্বায়ত্তশাসন জনজীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বর্তমান একচেটিয়া পুঁজির যুগে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রাজনীতি প্রশাসন — সবই অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত। পুঁজিবাদের গোড়ার যুগের গণতন্ত্র আজ আর নেই। একচেটিয়া পুঁজির শাসনে চূড়ান্ত আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের পটভূমিতে স্বায়ত্তশাসন ব্যর্থ হতে বাধ্য। তৃতীয় কারণ হল দুর্নীতি ও বৈষম্য, যা পুঁজিবাদ থেকেই জন্ম নিচ্ছে। কেন্দ্রের সরকার, এ জি পি সহ অন্যান্য দলের রাজ্য সরকার এবং স্বায়ত্তশাসনের ফলে ছিঁটেফোঁটা ক্ষমতার অধিকারী বড়ো নেতাদের দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের ফলে সামান্য যে রিলিফ পুঁজিবাদের মধ্যেও দেওয়া সম্ভব সেটাও বৃহত্তর বড়ো জনগণকে দেওয়া হয়নি। এই সামগ্রিক ব্যর্থতা ঢাকতে তারা আরও উগ্র স্লোগানে পৃথক রাজ্যের দাবি তুলে জনগণকে নতুন করে বিভ্রান্ত করে। ব্যর্থতাকে চাপা দিয়ে বড়ো জনগণকে আরও উগ্রতর উন্মাদনায় জড়িয়ে দিতে 'আবসু'র সশস্ত্র শাখা বড়ো লিবারেশন টাইগার এবার মুখ্য ভূমিকা নিয়ে পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে। পাশাপাশি স্বাধীন সার্বভৌম বড়োল্যান্ড গঠনের দাবিতে এন ডি এফ বি নামে সশস্ত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাসে সমস্ত এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যা পুরোপুরি আত্মঘাতী। এর দ্বারা জনগণের সমস্যার সমাধান তো হয়ই না, উল্টে তা শাসক-শোষকদের স্বার্থই পূরণ করে — যারা চায় জনগণ আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত থাকুক যাতে মুক্তির পথ, সঠিক গণআন্দোলনের পথ খোঁজার মনটাই উন্মাদনার চাপে মরে যায়। বছরের পর বছর উগ্র থেকে আরও উগ্র আন্দোলনের পথেই গত ১০ ফেব্রুয়ারি বি এল টির সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তারই ভিত্তিতে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের সংশোধন ঘটিয়ে স্বায়ত্তশাসিত বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট গঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই স্বায়ত্তশাসনও বড়ো জনসাধারণের প্রতি কেন্দ্র-রাজ্য সরকার এবং সংকীর্ণতাবাদী পৃথকতাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। দীর্ঘ আন্দোলনের পর পাওয়া স্বায়ত্তশাসনকে ঘিরে বড়ো জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গভীর আবেগ বহুলাংশে মোহের রূপে কাজ করছে। কিন্তু তাঁদের ভেবে দেখতে হবে অতীতের অভিজ্ঞতা কী বলে। স্বায়ত্তশাসন পেয়ে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর হয়ত সমৃদ্ধি আসবে কিন্তু ব্যাপক সাধারণ বড়ো জনগণ কী পাবে? এর পরিণামে, নতুন করে হতাশা আসবে এবং তার সুযোগে পৃথক বড়োল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে আরও উগ্র রাজনীতির উন্মাদনায় বড়ো জনগণকে জড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলবে। কিন্তু তাতেও বিভ্রান্তি প্রতারণা ছাড়া কিছু মিলবে কি? গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের মতো বড় বড় রাজ্যে যেখানে কোটি কোটি বেকার; সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব ও মধ্যবিত্তের পক্ষে জীবনধারণ করাই সমস্যা সেখানে স্বায়ত্তশাসন বা নতুন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হলে রাজ্য বা কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে ধনীর স্বার্থ দেখা ছাড়া আর কীই বা সম্ভব?

বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সেই এলাকায় নতুন করে যে সংখ্যালঘু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার ভবিষ্যৎ পরিণাম গুরুতর বলেই আমরা মনে করি। সুতরাং এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে, স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় বড়োরা সামগ্রিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। এখানকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ বড়ো, বাকি প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থাৎ মিলিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষ — যাদের মধ্যে রয়েছে, কোচ , রাজবংশী, সাঁওতাল, অসমীয়া, বাঙালি, নেপালি প্রভৃতি। স্বাভাবিকভাবেই এই বৃহত্তর জনসাধারণের অধিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামতকে উপেক্ষা করে যেভাবে এই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত হলো তাতে তাদের মনে জেগেছে প্রচণ্ড শঙ্কা ও ক্ষোভ। আসামের পূর্বতন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বর্তমানে পৃথক রাজ্য হিসাবে গড়ে ওঠা নাগাল্যাণ্ড মিজোরামে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্যের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে। সম্পত্তি বেচাকেনার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের ওপর চাপান বিধিনিষেধ, চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, ব্যবসাবাণিজ্যে লাইসেন্স অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ বাধায় সংখ্যালঘুরা জেরবার হচ্ছে। এজিপির আন্দোলনের ফলে বড়োদের মধ্যে আশঙ্কা ক্ষোভ যেভাবে বেড়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে বড়ো স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে অবড়ো জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি অ-বড়ো জনগোষ্ঠী মিলে গড়ে তুলেছে 'সম্মিলিত জনগোষ্ঠীয় সংগ্রাম সমিতি', যারা স্বায়ত্তশাসন বাতিলের দাবি জানাচ্ছে। এইভাবে বড়ো এবং অবড়ো জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের উর্বর জমি তৈরি হচ্ছে। স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় অ-বড়ো জনগোষ্ঠীর ক্ষোভকে দেখিয়ে ক্ষমতাসীন বড়ো নেতৃত্ব বড়ো জনগণের মধ্যে তাদের প্রভাব বাড়াচ্ছে ও সংহত করছে। বড়ো জনগণকে বিভ্রান্ত করে অবড়ো জনগণের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হচ্ছে।

আমরা মনে করি আত্মঘাতী সংঘর্ষ কোন জনগোষ্ঠীকেই সন্ত্রাস ও জীবনহানি ছাড়া কিছু দিতে পারে না। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলগুলি একের পর এক যে জনবিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে সেই আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এবং বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি আদায়ের জন্য যতদূর সম্ভব ব্যাপকতর ঐক্যের ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলাই আজ জরুরি প্রয়োজন। তাই নানা সম্প্রদায়ের গরিব মধ্যবিত্ত মেহনতি মানুষের ঐক্যকে কত বেশি প্রসারিত করা যায় — সেটিই সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রধান চিন্তা হওয়া দরকার। এই ঐক্য যত ব্যাপক হবে আন্দোলন ততই শক্তিশালী হবে, বাঁচার দাবিগুলি আদায়ের সম্ভাবনা ততই বাড়বে। তাই বর্তমান জটিল সংকটময় পরিস্থিতি এবং জনগোষ্ঠীগুলির পরস্পরের প্রতি অনাস্থা অবিশ্বাস — যা পৃথকতাবাদী নেতৃত্ব সৃষ্টি করেছে — সেকথা মাথায় রেখে বড়ো, অ-বড়ো কোন জনগোষ্ঠীরই এমন কোন দাবি তোলা বা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয় যাতে শোষিত জনগণের ঐক্যের ক্ষতি হয়। অ-বড়ো জনগণকেও মনে রাখতে হবে তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লড়াইকে সফল করতে হলে ব্যাপক সাধারণ বড়ো জনগণের নৈতিক সমর্থন পাওয়াটা অপরিহার্য।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বড়ো এবং অ-বড়ো সব মানুষকেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিশ্বের মেহনতী নিপীড়িত মানুষের মহান নেতা লেনিনের ব্যাখ্যা অনুসারে এই যুগটা হচ্ছে 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ'। মহান লেনিন বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তথ্য দিয়ে আমাদের সামনে এই সত্য তুলে ধরে গিয়েছেন যে এই যুগে পুঁজিবাদ তার প্রথম যুগের সমস্ত প্রগতিশীল চরিত্র নিঃশেষিত করে চূড়ান্ত ক্ষয়িষ্ণু রূপ ধারণ করেছে। পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নী পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। এই যুগে কোন প্রগতিশীল আন্দোলন বা মানুষের সামান্য আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণের আন্দোলনও পুঁজিবাদী অর্থাৎ বুর্জোয়া ভাবধারায় গড়ে উঠতে পারে না। এমনকি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও যদি কোন জায়গায় গড়ে ওঠে তাহলে তা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আধার নিয়ে গড়ে উঠতে হবে। জাতীয়তাবাদী চিন্তা যা বাস্তব অর্থে বুর্জোয়া ভাবধারা, তা আজকের যুগে অসার। তার পরিবর্তে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ সমস্ত জায়গায়, সমস্ত শোষিত মানুষের কাছে একমাত্র আদর্শ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে চোখ মেললেও দেখা যাবে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নামে বুর্জোয়া ভাবধারায় যতগুলো আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সবগুলোই অবধারিতভাবে গোষ্ঠী সংঘাতের পথ গ্রহণ করেছে, ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, মানুষের ঐক্যকে বিপর্যস্ত করেছে। সাধারণ মানুষের জীবনে কোন উন্নতিসাধন করতে পারেনি। অপরদিকে বহু ভাষা-ভাষী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী একজন মানুষ আর একজন মানুষের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। বাস্তব অর্থেও শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত কোন প্রশ্নেই কোন বিরোধ নেই। যথার্থ আদর্শের অনুপস্থিতিতে তারা যখন বুর্জোয়া ভাবধারার শিকারে পরিণত হন তখনই আপাত বিরোধ দেখা দেয়। বুর্জোয়াশ্রেণী এইভাবেই জনগণকে বিভক্ত করে রাখতে চাইছে।

এই সমস্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বড়ো ভাষাভাষী জনগণকে যদি পৃথকতাবাদী শক্তির প্রভাব এবং স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মোহ থেকে মুক্ত করে পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের পথে নিয়ে আসা যায়, যা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের যথার্থ পথ, তাহলে অতি অবশ্যই সেই ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগণ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার ও আশাআকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সংবেদনশীল হবেন এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উভয় অংশের জনগণের ন্যায্য দাবি পরিপূরণের পথে এগোনো সম্ভব হবে। এটাই একমাত্র শুদ্ধ পথ এবং সময়ের জরুরি প্রয়োজন।

মুর্শিদাবাদে স্বাস্থ্য কর্মশালা

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে ১৩ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর কালেকটরেট ক্লাব হলে একটি স্বাস্থ্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি প্রতিমা সিরাজ। এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা বলেন, কোথাও হাসপাতাল পরিণত হয়েছে পুলিশ ক্যাম্পে, কোথাও আবার ভেঙেপড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ভুতুড়ে বাড়ি। জেলা সদর সহ ব্লক হাসপাতালগুলিতে কুকুরের কামড়, সাপের কামড়ের ওষুধ পাওয়া যায় না। এরই মধ্যে বহরমপুর শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত একমাত্র চিকিৎসাকেন্দ্র সদর হাসপাতালকে কার্যত তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

স্বাস্থ্য কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ডাঃ অশোক সামন্ত

ডাঃ অশোক সামন্ত আলোচনা করে দেখান কীভাবে সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বেসরকারীকরণ করে লাভজনক পণ্যে পরিণত করতে চাইছে। জেলা সদর সহ ব্লকে ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ডাঃ অশোক সামন্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতি ডাঃ কালিপদ সরকার ও জেলা সম্পাদিকা

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন

৪-৫ ফেব্রুয়ারি স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির ৩য় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে। ৪ ফেব্রুয়ারি বেলা ২টায় বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে সহস্রাধিক বেকার যুবক-যুবতীর উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশ শুরু হয় সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি দীপক ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মেদিনীপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তীর্থঙ্কর ব্যানার্জী, লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক, আইনজীবী আন্দোলনের নেতা ভবেশ গাঙ্গুলী, অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সহ-সভাপতি অমর রায়, এ আই ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সম্পাদক রূপম চৌধুরী, আর ওয়াই এ-এর রাজ্য সম্পাদক সুব্রত সেনগুপ্ত, মেদিনীপুরের প্রাক্তন কাউন্সিলার ভানুরতন গুঁইন, অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক মেঘনাদ ত্রিপাঠী, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক চণ্ডীচরণ হাজরা প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বনিযুক্তি প্রকল্পের নামে বেকার যুবকদের ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর করার পরিকল্পনা আসলে নির্বাচনী স্বার্থপূরণের জন্য। ১০-১৫-২৫ হাজার টাকার ব্যাঙ্কঋণ দিয়ে আজ কোন ব্যবসা বা শিল্প গড়ে তোলা যায় না। প্রকল্পগুলি যে ব্যর্থ হতে বাধ্য তা সরকার জেনেও বেকার যুবকদের ঠকানোর পরিকল্পনায় এই প্রকল্প নিয়েছে। এখন এই ঋণ আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতা বেকার যুবকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে দিচ্ছে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কগুলি থেকে বড় বড় শিল্পপতিদের যে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল তা এখনও অনাদায়ী। সরকার সেই ঋণ আদায় করছে না। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে ১০ কোটি টাকার বেশি ঋণ বাকি থাকলে তা আদায় করার কোন আইন নাকি নেই। সরকার বড় বড় পুঁজিপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ ছাড় দিচ্ছে আর কয়েক হাজার টাকা ঋণী বেকার যুবকদের উপর হয়রানি ও অত্যাচার চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সমস্ত বক্তা।

চার শতাধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে ৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি সারাদিন প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হলে শহীদ তন্ময় মুখার্জী মঞ্চে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, মূল প্রস্তাব, সংগঠনের গঠনতন্ত্রে সংশোধন ও সংযোজন সহ অন্যান্য প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

সম্মেলনে নন্দদুলাল দাসকে সম্পাদক, প্রবীর মাহাতোকে সভাপতি ও চণ্ডীচরণ হাজরাকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৭ জনের রাজ্য কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ব্লকস্তরে, মার্চ মাসের মধ্যে জেলা স্তরে এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি রাজ্যস্তরে স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির ১০ দফা দাবি নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির রাজ্য সম্পাদক

উত্তরপ্রদেশে ব্যাঙ্ক কর্মচারী কনভেনশন

উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে গত ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কনভেনশন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কর্মচারীস্বার্থ বিরোধী ১৮ দফা শর্ত মেনে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলি যেভাবে ৮ম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে তার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সারা ভারত ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সভাপতি কমরেড এম সি ত্যাগী। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বিজয়পাল সিং। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে বলেন — ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির বেশির ভাগ যেহেতু সি পি আই, সি পি এম নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত এবং এই রাজনৈতিক দলগুলি যেহেতু ক্ষমতায় গিয়ে বেসরকারীকরণকে উৎসাহিত করছে, শিক্ষা-চিকিৎসার ক্ষেত্রে চুক্তি প্রথা তথা ঠিকাদারি প্রথা চালু করছে, শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে তাই তাদের পক্ষে যথার্থ ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, দিল্লী রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড এ কে মজুমদার বলেন, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের নেতৃবৃন্দও যে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলন থেকে সরে যাবেন না তার একমাত্র গ্যারান্টি কর্মচারীদের সচেতনতা এবং নেতৃত্বের কার্যপ্রণালীকে প্রতিনিয়ত যাচাই করা। কনভেনশনে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেডস্ রাজিন্দর সিংহ, বলরাম সিংহ (হরিয়ানা), এ নটরাজ (কর্ণাটক), পূর্ণ বেহেরা (ওড়িশা), অরবিন্দ শর্মা (মীরাট), প্রতাপ সিংহ (দিল্লী) প্রমুখ। কনভেনশন শেষে সংগঠনের গাজিয়াবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ভেদরাম সিংহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশাল সংখ্যায় জমায়েত হয়ে কনভেনশনকে সফল করার জন্য উপস্থিত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ত্রিপুরায় রান্নার গ্যাসের কালোবাজারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

কিছুদিন যাবৎ আগরতলা শহরসহ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রান্নার গ্যাসের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গ্যাসের জন্য ভোক্তাগণ দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়েও গ্যাস সিলিন্ডার সংগ্রহ করতে পারছেন না। কালোবাজারে প্রতি সিলিন্ডার ৪০০ টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। এমতাবস্থায় গত ১৩ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকের নিকট নিম্নলিখিত দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়ঃ (১) অবিলম্বে রান্নার গ্যাসের কৃত্রিম সঙ্কট দূর করতে হবে, (২) রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। স্মারকলিপি প্রদান কালে দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কমরেড শিবানী দাস ও সঞ্জয় চৌধুরী। পরে বটতলায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সঙ্কটকালে সরকারের উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করে বক্তারা এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শিশুরা বিপন্নতার গহ্বরে

চারের পাতার পর

নীতির ফলে শিশুদের জীবন থেকে বিশ্রাম চলে গেছে, তারা অপুষ্টির শিকার হচ্ছে, রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ না করা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য বেসরকারীকরণের ঘটনা দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থেই বিশ্বায়নের পথ ধরে এসেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার এইসব সুপারিশকে ভারতের বড় বড় পুঁজির মালিকরা দু'হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছে। টাটা-আম্বানিরা বলছে, আর্থিক সংস্কার নীতি যা বিশ্বায়ন-উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণেরই অপর নাম, তা নাকি 'ভারতের সামনে বিরাট সুযোগ' খুলে দিয়েছে। ওদের এই 'ভারত' কোটি কোটি অনাহারী শিশুদের ভারত নয়, এ ভারত মুষ্টিমেয় ধনীর, বিপুল পুঁজির মুষ্টিমেয় মালিকদের — যাদের স্বার্থেই রাষ্ট্র ও সরকার জনগণকে খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পানীয় জল-পরিবহন-চাকরি দেওয়ার সকল দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সবকিছুই তুলে দিয়েছে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের মুনাফার হাড়িকাঠে।

[টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া (১৭-২-০৪) পত্রিকায় ইলা ডি হুক্কুর প্রবন্ধ অবলম্বনে]

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান

দুই বুর্জোয়া দল বিজেপি ও কংগ্রেসকে পরাস্ত করুন
মেকি বামপন্থীদের মুখোশ খুলে দিয়ে গণআন্দোলনের শক্তিকে জয়ী করুন

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই সাথে কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করেছে। ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে দলের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর নিন্দা করে বলেছেন যে, ভোটে সর্বাধিক ফয়দা তোলার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ত্রয়োদশ লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জনগণের টাকায় গড়া সরকারি তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজ্য সরকার ভোটে ফয়দা তুলতে যেভাবে বিজ্ঞাপনের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় কমিটি তার তীব্র নিন্দা করেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে মনে করে, একদিকে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দুই প্রতিক্রিয়াশীল দল বিজেপি ও কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দিতে ও তাদের পরাজিত করতে, অন্যদিকে সংসদের ভিতরে ও বাইরে জনগণের জরুরি দাবিগুলিকে নিয়ে ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বনিত করার জন্য একটি প্রকৃত বাম-গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তোলা ছিল জরুরি প্রয়োজন। অথচ কেন্দ্রীয় কমিটি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করল — এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে উপলব্ধি না করে সি পি এম ও সি পি আই বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়বার অজুহাতে ক্ষমতাসীন পুঁজিপতিশ্রেণীর অপর আস্থাভাজন দল কংগ্রেসের পিছু ধরার রাস্তা নিল — যে কংগ্রেস গোটা দেশে তাদের দীর্ঘ শাসনকালে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের সাম্প্রদায়িক ও বিভেদমূলক রাজনীতির চর্চা করেছে ও তাতে মদত দিয়েছে। সি পি আই (এম) ও সি পি আইয়ের ভূমিকার নিন্দা করে কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছে, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীকে তোয়াজ করে চলা ও ভোটে সর্বাধিক ফয়দা তোলা — এই দুই স্বার্থপূরণের জন্যই তারা এমন চরম সুবিধাবাদী রাজনীতির চর্চা করছে।

এই পরিস্থিতিতে জনগণের দুই চরম শত্রু, বিজেপি ও কংগ্রেসকে পরাস্ত করার জরুরি প্রয়োজন ভোটদাতাদের কাছে তুলে ধরার এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবেই সংসদীয় নির্বাচনী লড়াইকে পরিচালনা করার আবশ্যকতা জনগণকে বুঝিয়ে বলার ও সেই প্রক্রিয়ায় মেকি বামপন্থীদের মুখোশ খুলে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই কেন্দ্রীয় কমিটি আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

লোকসভায় এস ইউ সি আই-এর প্রার্থী তালিকা

আসাম	১।	করিমগঞ্জ (এস সি)	কমরেড রাধাকান্ত তাঁতি
	২।	শিলচর	কমরেড কান্তিময় দেব
	৩।	মঙ্গলদৈ	কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতি
	৪।	ধুবড়ি	কমরেড মিন্‌হার আলি মণ্ডল
অন্ধ্রপ্রদেশ	৫।	অনন্তপুর	কমরেড বি এস অমরনাথ
বিহার	৬।	বৈশালী	কমরেড অশোক কুমার সিংহ
দিল্লী	৭।	পূর্ব দিল্লী	কমরেড হরিশ ত্যাগী
গুজরাট	৮।	বরোদা	কমরেড তপন কুমার দাশগুপ্ত
হরিয়ানা	৯।	রোহটক	কমরেড অনুপ সিংহ
	১০।	সোনেপত	কমরেড হরি প্রকাশ
	১১।	মহেন্দ্র গড়	কমরেড রাজেন্দর সিংহ
ঝাড়খণ্ড	১২।	জামশেদপুর	কমরেড সীতারাম টুডু
কেরালা	১৩।	তিরুবনন্তপুরম	কমরেড বি কে রাজাগোপাল
	১৪।	কোল্লাম	কমরেড শৈলা কে জোহন*
	১৫।	আলাপ্পুজা	কমরেড পার্থসারথি ভার্মা
	১৬।	মাভেলিক্কারা	কমরেড এস রাধামণি*
	১৭।	কোট্টায়াম	কমরেড মিনি কে ফিলিপ*
	১৮।	কালিকট	কমরেড ডাঃ ডি সুরেন্দ্রনাথ
কর্ণাটক	১৯।	গুলবর্গা	কমরেড ভগবান রেড্ডি
	২০।	বেলারি	কমরেড কে সোমশেখর
	২১।	বাঙ্গালোর দক্ষিণ	কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ
	২২।	বাঙ্গালোর উত্তর	কমরেড কে উমা*
ওড়িশা	২৩।	জাজপুর (এস সি)	কমরেড রাধাবল্লভ মল্লিক
তামিলনাড়ু	২৪।	চেন্নাই সেন্ট্রাল	কমরেড এন কুমারেশ
	২৫।	পেরিয়াকুলাম	কমরেড ভেনুগোপাল
উত্তরপ্রদেশ	২৬।	মছলি শহর	কমরেড জগন্নাথ ভার্মা
পশ্চিমবঙ্গ	২৭।	দার্জিলিং	(পরে ঘোষিত হবে)
	২৮।	কোচবিহার (এস সি)	কমরেড নৃপেন কার্যী
	২৯।	আলিপুর দুয়ার (এস টি)	কমরেড রামপ্রতাপ বরাইক
	৩০।	জলপাইগুড়ি	কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী
	৩১।	বালুরঘাট (এস সি)	কমরেড বিনয় মল্লিক
	৩২।	জঙ্গীপুর	কমরেড আবদুস সয়ীদ
	৩৩।	মুর্শিদাবাদ	কমরেড খাদিজা বানু
	৩৪।	বহরমপুর	কমরেড অপূর্ব ব্যানার্জী
	৩৫।	কৃষ্ণনগর	কমরেড সেখ খোদাবক্স
	৩৬।	নবদ্বীপ (এস সি)	কমরেড গোপাল বিশ্বাস
	৩৭।	বারাসাত	কমরেড শঙ্কর ঘোষ
	৩৮।	বসিরহাট	কমরেড কার্তিক সরকার
	৩৯।	জয়নগর (এস সি)	কমরেড তরুণ নস্কর
	৪০।	মথুরাপুর (এস সি)	কমরেড প্রহ্লাদ কুমার পুরকাইত
	৪১।	ডায়মন্ডহারবার	কমরেড আবদুর রউফ
	৪২।	যাদবপুর	কমরেড বনশ্রী চক্রবর্তী
	৪৩।	ব্যারাকপুর	কমরেড অমল সেন
	৪৪।	হাওড়া	কমরেড অলোক ঘোষ
	৪৫।	শ্রীরামপুর	কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য
	৪৬।	তমলুক	কমরেড মানব বেরা
	৪৭।	কাঁথি	কমরেড জীবন দাস
	৪৮।	মেদিনীপুর	কমরেড পঞ্চানন প্রধান
	৪৯।	ঝাড়গ্রাম (এস টি)	কমরেড কার্তিক মারডি
	৫০।	পুরুলিয়া	কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য
	৫১।	বাঁকুড়া	কমরেড ভাস্কর ভদ্র
	৫২।	বিষ্ণুপুর (এস সি)	কমরেড শ্রবণ মণ্ডল
	৫৩।	আসানসোল	কমরেড সুনীল মুখার্জী
	৫৪।	কাটোয়া	কমরেড জাকারিয়া বিশ্বাস
	৫৫।	বোলপুর	কমরেড বিজয় দলুই
	৫৬।	বীরভূম (এস সি)	কমরেড ব্রজমোহন দাস

* মহিলা প্রার্থী

বিধানসভার প্রার্থী তালিকা

অন্ধ্রপ্রদেশ	১।	অনন্তপুর	কমরেড জি ললিতা
কর্ণাটক	১।	গুলবর্গা	কমরেড ভি নাগাম্মল
	২।	শাহ্‌বাদ	কমরেড এইচ ভি দিবাকর
	৩।	বেলারি	কমরেড এম এন মঞ্জুলা
	৪।	রাইচুর	কমরেড টি এস সুনীত কুমার
	৫।	মহীশূর	কমরেড এম শশিধর
	৬।	মালেশ্বরম	কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী
	৭।	রাজাজিনগর	কমরেড বি এস প্রতিভা কুমারী
	৮।	বাসবনগুড়ি	কমরেড ভি এন রাজশেখর
	৯।	বিন্নিপেট	কমরেড এম এন শ্রীরাম
ওড়িশা	১।	যশিপুর (এস টি)	কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক
	২।	বিন্‌ঝারপুর (এস সি)	কমরেড সুরেন্দ্র মল্লিক
	৩।	আথমালিক	কমরেড ভীমসেন বেহেরা

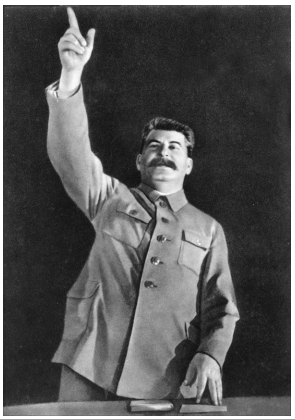

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা

স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে

জনসভা

৫ মার্চ, ২০০৪ বিকাল ৩-৩০মি.

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, কলকাতা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড মানিক মুখার্জী

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net